


Vol. 35 | No. 1 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কাব্য : প্রেক্ষাপট ও বৈশিষ্ট্য

| | |
|---|---|
| Volume | 35 |
| Issue | 1 |
| Year | 1991 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | মনোয়ারা হোসেন |
| Published online | October 1, 1991 |
| DOI | 10.62328/sp.v35i1.7 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v35i1.7 |
| Pages | 77-84 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কাব্য : প্রেক্ষাপট ও বৈশিষ্ট্য

মর্শেয়ারা হোসেন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দেড়দশকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য *কল্পনা* (১৩০৭; ১৯০০); *নৈবেদ্য* (১৩০৮; ১৯০১), *খেয়া* (১৩১৩; ১৯০৬), *গীতাঞ্জলি* (১৩১৭; ১৯১০), *চৈতালি* (১৩১৯; ১৯১২), *স্মরণ উৎসর্গ* (১৩২১; ১৯১৪), *গীতমাল্য* (১৩২১; ১৯১৪), *গীতালি* (১৩২১; ১৯১৪)। বিংশ শতাব্দীর পালাবদলের চিহ্নযুক্ত প্রথম রবীন্দ্রকাব্য *বলাকা* (১৩২৩; ১৯১৬)— কবির নোবেল পুরস্কার লাভের পরবর্তী এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক সৃষ্টি। পরবর্তী কাব্য *পলাতকা* (১৩২৫; ১৯১৮), *পূরবী* (১৩৩২; ১৯২৫) ও মহুয়া (১৩৩৬; ১৯২৯), রচনা বা প্রকাশের দিক থেকে *বলাকা* কাব্যের পরবর্তী হলেও ভাবের দিক থেকে পূর্ববর্তী। রাশিয়া ভ্রমণের পরবর্তী রচনা– *বনবাণী* (১৩৩৮; ১৯৩১), *পরিশেষ* (১৩৩৯, ১৯৩২), *পুনশ্চ* (১৩৩৯; ১৯৩২), *বিচিত্রিতা* (১৩৪০; ১৯৩৩), *শেষসপ্তক* (১৩৪২; ১৯৩৫), *বীথিকা* (১৩৪২; ১৯৩৫), পত্রপুট (১৩৪৩; ১৯৩৬), *শ্যামলী* (১৩৪৩; ১৯৩৬), *প্রান্তিক* ((১৩৪৪; ১৯৩৮), *সেঁজুতি* (১৩৪৫; ১৯৩৮) এবং *আকাশ প্রদীপ* (১৩৪৬; ১৯৩৯) : রবীন্দ্রনাথের চল্লিশের দশকের শুরুতে প্রকাশিত কাব্য *নবজাতক*, *সানাই* (১৩৪৭; ১৯৪০), *রোগশয্যায়* (১৩৪৭; ১৯৪০), *আরোগ্য* (১৩৪৭; ১৯৪১), *জন্মদিনে* (১৩৪৭–৪৮; ১৯৪১) এবং এ দশকেই মৃত্যুর পর প্রকাশিত *শেষলেখা* (১৩৪৮; ১৯৪১), রবীন্দ্র-জীবনের শেষ দশ বছরের কাব্য *পুনশ্চ* থেকে *শেষলেখা* (১৩৩৯; ১৩৪৮; ১৯৩২–১৯৪১)। এ পর্যায়ের কাব্যকে উত্তরকাব্য বলা হয়— যা বিভিন্ন দিক থেকে পূববর্তী কাব্য অপেক্ষা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট—কবির দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সারাৎসার। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশকের কাব্যের পটভূমিকা ও কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করা হবে।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে সংগঠিত স্বদেশ ও বিশ্বের ঘটনাবলী কবির অভিজ্ঞতা ও চেতনাকে যে-ভাবে স্পর্শ করেছে, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতি ও প্রকৃতি চেতনার সম্পর্ক বর্তমান। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কানাডা, জাপান ও ইন্দোচীন ভ্রমণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ রূপ ও রঙের খেলায় মেতে ওঠেন অর্থাৎ ছবি আঁকতে শুরু করেন এবং একজন আধুনিক চিত্র-শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এ সময়ের একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

> রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতের প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাতা ছেড়ে চলে গেল। ... কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবে ও গোড়াতে মাথায় আসে, তারপর.... ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে। আমি যে-সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উল্টা প্রণালী, রেখার আমেজ প্রথম দেখা দেয় কলমের মুখে। তারপর যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। [পত্র "২৩"; *পথে ও পথের প্রান্তে* ; ২১শে কার্তিক ১৩৩৫]

রেখার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আসক্তি উত্তরকাব্যের নিসর্গ চিত্রণেও লক্ষ্য করা যায়— যেখানে প্রকৃতি কল্পনা নয় দৃশ্যনির্ভর।

রবীন্দ্রনাথের চেতনায় এ সময়ে এই সত্য বড় হয়ে ওঠে যে, সাধারণ মানুষই ইতিহাসের নিয়ামক। তিনি ঐ বিশ্বাস উত্তর-জীবনে অর্জন করেন- উত্তর আমেরিকা ইউরোপ, রাশিয়া ও দূর প্রাচ্যের ঘটনাবলী এবং সফর থেকে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শেষবার ইউরোপ ভ্রমণ করেন— উদ্দেশ্য ছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতা দান। প্রথমে তিনি যান ফ্রান্সে চিত্রপ্রদর্শনী উপলক্ষে। এ সময়ে স্বদেশে দ্বিতীয় দফা আইন অমান্য আন্দোলন চলছে; ঘটে গিয়েছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মত অভূতপূর্ব ঘটনা আর শুরু হয়েছে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশের ঐ অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ পরিস্থির সংবাদ রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ডে বসেই পেয়েছিলেন। সেখানকার "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকায় ভারতের অবস্থা এবং ইংরেজ শাসন সম্পর্কে পত্র ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। ঐ সময় ইংলন্ডে কোয়েকার'দের বার্ষিক সভায় ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে কবির বক্তৃতা বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। কবি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—

> I ask you for your co-operation and that you may realise yourselves in our place and recall the time when your brothers in America wanted to secure their freedom with the blood. Will you realise we want the privilege of

> serving our own country in our own way and to solve our problems. Give us the right to serve our own country. *(The Friend*, 30th May, 1930)

ইংলন্ড সফর শেষে জার্মানীতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের বিকৃতি অর্থাৎ উগ্র জাতীয়তাবাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা হয়। বার্লিনে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল এবং এখানকার 'ওবারামারগান' গ্রামে দক্ষিণ জার্মানীর ঐতিহ্যবাহী 'প্যাশন প্লে' দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন যার প্রভাবে রচিত হয় তাঁর 'The Child' কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথ জার্মানী, ডেনমার্ক এবং সুইজারল্যান্ড সফর শেষে যান সোভিয়েত রাশিয়ায়।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া সফরে গিয়ে এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। মস্কোতে লেখক গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে রুশ লেখক লেখিকাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, 'পাইওনিয়ার কমিউনে' কিশোর কিশোরীদের জীবন-ধারা পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্রীয় কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা, মস্কো স্টেট মিউজিয়ামে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী এবং ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রে শ্রমিকদের সভায় যোগদান কবির জন্য ছিল এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা—যে অভিজ্ঞতা তিনি ইউরোপ বা আমেরিকার সমাজ থেকে পাননি। কবি একটি পত্রে লিখেছিলেন—

> দেশের ইতিহাসে অনেক কিছু উলট-পালট হবে জীবন যাত্রাকে গোড়া ঘেঁষে বদল করবার দিন এল। --ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ সকলকেই পেতে হবে, সংকট এড়িয়ে আরামে থাকবার প্রত্যাশা করাই ভুল। [পত্র- ৪০; *চিঠিপত্র* ২য়']

মূলতঃ রাশিয়া সফরে সেখানকার লেখক, কিশোর ও শ্রমিকদের জীবনধারা কবির দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

রাশিয়ার পরে রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা সফর তুলনামূলকভাবে হতাশাব্যঞ্জক ছিল। রবীন্দ্রনাথ ধনী দেশ আমেরিকায় গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তিনমাস আমেরিকায় অবস্থান করলেও উদ্দেশ্য সফল হয়নি। "হোটেল বিলট্ মোর"-এ কবির জন্য আয়োজিত ভোজসভায় ধনী ব্যবসায়ীরা থাকলেও লেখক-লেখিকা কেউ ছিলেন না। তিনি 'প্রেসিডেন্ট হুভারের' সাক্ষ্যাৎ পেয়েছিলেন কিন্তু আমেরিকায় কবির বক্তৃতার কোন আয়োজন হয়নি। সে দেশে কবির চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল কিন্তু বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ সংগ্রহে তিনি সফল হননি।

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষ দিকে দেশে ফিরেছিলেন আর সে বছর তাঁর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন—

> একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছু নয়। আমি কবি মাত্র। আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী, গুরু বা নেতা নই -- আমি বিচিত্রের দূত [২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্তর বছর বয়সে যে পরিচয় দাবী করেছিলেন তা উত্তরকাব্য এবং উত্তরকাব্যের প্রকৃতি চেতনায় স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ পর্যায়ে তিনি তত্ত্বজ্ঞানী বা শাস্ত্রজ্ঞানী নন— বিশ্বের বিচিত্র জীবনধারার বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে সেখানে সহজভাবে কবি ও মানুষ রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত।

উল্লেখ্য যে কবি তাঁর জীবনের শেষদশকে দেশের ঘটনাপ্রবাহ থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে দেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অশান্তি ও সংকটে সরকারী দমন-নীতির প্রতিবাদে প্রৌঢ় কবিকে সোচ্চার হতে হয়েছিল। মেদিনীপুর হিজলী জেলে রাজবন্দীদের ওপর চরম অত্যাচারের প্রতিবাদে কলকাতা গড়ের মাঠে বিরাট সমাবেশে জাতির বিবেকরূপে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন রবীন্দ্রনাথ। স্মরণীয় যে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদেই লিখিত *পরিশেষ* কাব্যের প্রশ্ন কবিতাটি।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান ইরান ও ইরাক সফর করেন। ঐ বছর ৭ই আগষ্ট জর্মানীতে কবির প্রিয় দৌহিত্র নীতুর মৃত্যু হয়। এই পটভূমিকায় রচিত কবির *বনবানী* *পরিশেষ* *কালের যাত্রা* এবং *পুনশ্চ*-র অনেক কবিতা। পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিবসে শান্তিনিকেতনে সদ্য নির্মিত মাটির ঘর 'শ্যামলী'তে কবির গৃহ প্রবেশ হয়। এই মাটির ঘর নিয়ে কবি বেশ কিছুদিন মেতে ছিলেন। মনে হয় জীবন সায়াহ্নে মাটির কাছাকাছি আসার জন্য কবির যে আকুলতা ছিল *শ্যামলী* তারই প্রতীক। *শ্যামলী* কাব্যের নামকরণও এ ঘর থেকে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কবি শেষবারের মত 'পতিসর মহল' ঘুরে যান। এই সফরই কবির শেষ উত্তর ও পূর্ববঙ্গ সফর।

কবির জীবনের শেষ কয়েকটি বছর যুদ্ধের কাল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়— যার উদ্যোক্তা ছিল জার্মানী আর জাপান। ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয় আর হিটলার জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে মধ্য-ইউরোপ গ্রাস করে। জাপান, ইতালী ও জার্মানীতে স্বৈরাচার, ফ্যাসীবাদ ও নাজীবাদের অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া কবি শান্তিনিকেতনে অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে 'সভ্যতার সঙ্কট' ভাষণে প্রকাশ করেন। বিশ্বযুদ্ধে মানবতার চরম অবমাননায় কবির যে প্রতিক্রিয়া তা *নবজাতক* কাব্যের 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটিতে প্রকাশিত। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যে স্বদেশের

সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অশান্তি ছায়াপাত করেছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ সর্বাত্মক আকার ধারণ করলে ইংল্যান্ড সে যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ ভারতও। ঐ সব ঘটনাস্রোত প্রৌঢ় কবিকে বিচলিত, বিষণ্ন ও বিক্ষুব্ধ করেছিল। কবির ঐ মানসিক অবস্থা উত্তরকাব্যের তথা উত্তরজীবনের প্রকৃতি ও নিমর্গ চেতনাকে আচ্ছন্ন না করে পারেনি।

প্রায় আশি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ একটি আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট শান্তিনিকেতনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী দান করেন। লক্ষণীয় যে বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেন আরো বেশী বাস্তব, বেশী আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন। সনাতন রীতির চেয়ে তখন তিনি বাস্তব সত্যকে বড় করে দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে। এ মানসিকতা তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যকেও প্রভাবিত করেছে।

মূলতঃ *পুনশ্চ* থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় যে নবরীতির শুরু সেখানে ছন্দবিন্যাসেই তিনি পুরাতন ধারার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেননি বিষয় নির্বাচনেও করেছেন। উত্তরকাব্যের প্রকৃতি বর্ণনায় কবি তুচ্ছ ও সাধারণ উপাদানের ব্যবহার করেছেন— যা তিনি আগে দেখেছিলেন অথচ কবিতায় যা সমাদৃত হয়নি। অরণ্য, বৃক্ষ, ফুল, ফল বা উদ্ভিদের বর্ণনা বা আবাহন রবীন্দ্রকাব্যে নতুন নয়; কিন্তু এ পর্বে আম, জাম বা য়ুকলিপটাসের পাশে স্থান পেয়েছে হর্তকি, (ক্যামেলিয়া, *পুনশ্চ* ) হেলঞ্চ (পুকুর ধারে/ *পুনশ্চ* ) মানকচু বা কলমি শাক (*পুনশ্চ* ) চাঁপা, করবী, ম্যাগনোলিয়ার পাশে তেঁতুল, সজনে, শনের ফুল— বিভিন্ন গাছের মঞ্জরী এসব অনাদৃত আর উপেক্ষিত উদ্ভিত আর ফুলের সাথে প্রকৃতিসংলগ্ন কীটপতঙ্গ ধানপচানী বা শ্যাওলার গন্ধ (চার/ *শেষ সপ্তক* ) প্রবীন রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রগামিতারই পরিচয়াক। এ পর্বে আরেকটি পরিচিত দৃশ্য বা উপাদান পাওয়া যায়, গোরুর গাড়ি, বলদের গাড়ি বা মহিষের গাড়ি যা গ্রাম বাংলার সনাতন বাহন। তবে এ পর্বে ট্যাক্সি, ট্রাম, ট্রেনের উপস্থিতি সমাজ পরিবর্তনের এবং নগরজীবনের পরিচায়ক। পল্লীবাংলার নিসর্গের আর একটি অপরিহার্য উপাদান নৌকা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এসেছে —*পুনশ্চ* পূর্ব কাব্যের মত রূপক বা প্রতীক রূপে নয়। বিভিন্ন প্রকার নৌকা পাই উত্তরকাব্যে— গুণটানা নৌকা, ঘরমুখো নৌকা, জেলে নৌকা, ডুবো নৌকা, ইত্যাদি। ঐসব নৌকার মধ্যে যে জেলে নৌকা বেশী পাই তাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। উত্তরকাব্যে নৌকার বৈচিত্র্য

পূর্বজীবনের স্মৃতির ফল।

আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথ তুচ্ছ ও সাধারণ উপাদান ব্যবহার করেছেন অথচ তার পরিচর্যায় স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করার মত। ভাঙা পাঁচিলে হলদে সাদা বেগনি ফুলে পরিপূর্ণ বিচিত্র লতাগুল্ম আর শঙ্খমণি খালে ছাতিম গাছের মরা শাখা (সময়হারা/ *আকাশ প্রদীপ* )— প্রাচুর্য ও দীনতার সংমিশ্রণে বৈচিত্র্যময় চরে বালুতে কচ্ছপের (ঝড়/ *ছড়ার ছবি* ) রোদ পোহানো, কাঁঠাল বা প্রাচীন চাঁপা গাছের মোটা গুঁড়ি, জলের ঝিলিমিলির মধ্যে পাতাছড়ানো শ্যাওলা (ছেলেটা/ *পুনশ্চ* ), ঝুরিনামা বৃদ্ধ বটের শিকড় বা ডাল মেলে দেবার বিচিত্র ভঙ্গী (ছত্রিশ/ *শেষসপ্তক*) কবির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচায়ক। ডোবার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মহিষগুলিকে দেখতে গিয়ে তিনি ডোবার পাতা–পচা পাঁক জমানো জলে তথা সমস্ত পরিবেশটুকু তুলে দরেছেন (প্রবাসে/ *ছড়ার ছবি* )। রোদের আলো মাঠে আর বাটেই ছড়িয়ে পড়েনি, সে রোদ মহাজনের টিনের ছাদ থেকে শুরু করে শাকসব্জী, চুবড়ী, আঁটি–বাঁধা খড়ে, নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে (পাঁচ/ *পত্রপুট* ) সেটুকু তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এ পর্যায়ের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র তুচ্ছ উপাদানকে তুলে ধরেছেন তা নয়, বলা যেতে পারে এই সব সহজ প্রকৃতি কবির কাছে অস্তিত্বের পূর্ণমূল্যে দেখা দিয়েছে। এখানে সহজ প্রকৃতির মধ্যে তিনি আবহমানকালের প্রাণের প্রবাহটি প্রত্যক্ষ করেছেন।

এ পর্বে প্রকৃতি বর্ণনায় রঙের প্রাচুর্য লক্ষ্য করার মতো। কালো, নীল, খয়েরি, লাল, বেগুনি, সবুজ, সাদা, বাদামী অর্থাৎ প্রধান প্রধান রঙ ছাড়াও এ পর্বে যা চোখে পড়ে তা হল বিভিন্ন রং এর বৈচিত্র্য বা মিশ্রণ —যেমন শুধু 'নীল' নয়— পাণ্ডুনীল, ফিকে নীল (*পুনশ্চ* ), পাণ্ডুনীল সবুজ, ফিকে নীল বেগনি (চার/ *শেষসপ্তক* ) অথবা ফিকে বেগনি (শেষদান/ *পুনশ্চ* ), বেগনি সাদা। লাল থেকে লাল কালো, লাল কালো সাদা, লাল বাদামী আসমানী, লাল সবুজ। সবুজ থেকে চিকন-সবুজ (এগার/ *শেষসপ্তক* ) সবুজ-কালো-সাদা, সবুজ-পাটল (*আকাশ প্রদীপ* ) সবুজ-লাল, সবুজ-সোনা, সবুজ-হলুদ। সাদা থেকে সাদা-লাল বা সাদা-সোনা। এ ছাড়াও রয়েছে এমন কিছু রং যা শুধু 'মিশোল' নামেই বর্ণনীয়(বাসা/ *পুনশ্চ* )

এ পর্যায়ের কাব্যে প্রকৃতির সহজ, সাধারণ, মানুষ ও তাদের জীবনাচারণ প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য আংশরূপেই স্থান পেয়েছে। তাই পাঁচমিশেলি শাক সব্জী তোলায় ব্যস্ত কলুবুড়ি (৫/ *ছড়া* ) থেকে শুরু করে মাসিকপত্রে মগ্ন আধুনিকা (৫/ *ছড়া* ) বা ঝালরওখালা বেণী-করা হাঁসের ছানা বুকে করে নিয়ে আসা ছোট

মেয়েটিও (এগারো/ *শেষসপ্তক* ) সমাদৃত। বিচিত্র পল্লীনারী— কখনো তাদের কাঁখের ঝুড়িতে কচুশাক, কাঁচা আম, সজনে ডাঁটা (এগারো/ *শেষসপ্তক* ) কখনো তারা অনাদৃত তুচ্ছ দামের শাক আহরণে ব্যস্ত। এ মেয়ে শুধু পল্লীর বাঙালী মেয়ে নয়; বাঁদরছানার উঁকুন ছাড়ানোয় মগ্ন বেদের মেয়ে (*৫/ছড়া* ) বা কচু পাতায় মাথা ঢেকে পেয়ারা খাওয়ায় ব্যস্ত সাঁওতাল মেয়ে (*৫/ছড়া* )। হাটযাত্রী কুমোর, ছাতিহাতে পাঁচটাকা বেতনের গুরু বা পঁচিশ টাকা বেতনের সদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী (বাঁশি/ *পুনশ্চ* ) বাইকরথে চড়া খবরওয়ালা (উৎসর্গ/ *শ্যামলী* ) ওঁরাও জাতের মালি ও মালিনী (উৎসর্গ/ *শ্যামলী* )। নতৃপৃষ্ঠ ক্লিষ্টগতি গুনটানা মাল্লার পাশাপাশি বিচিত্র প্রকৃতির ছেলেও এখানে অপ্রত্যক্ষ নয়। কখনো সে পরের ঘরে মানুষ, বছর দশেক বয়সের (ছেলেটা/ *পুনশ্চ* )। কখনো সে অশথতলায় বাঁশি বাজানোয় মগ্ন। কখনো ছুটির দিনে ভোরবেলায় বস্তা-বহা গোরুকে *ঠেলা* দিয়ে উল্লসিত (ঘর ছাড়া/ *সেঁজুতি* ) কখনো সে পাঠশালায় নামতা মুখস্ত করে (অকাল ঘুম/ *শ্যামলী* ) কখনো তর্মুজের লতা থেকে ছাগল খেদানোতে ব্যস্ত (৪/ *আরোগ্য* )

এ পর্যায়ের কাব্যে উপমা চিত্রকল্প ব্যবহারে অভিনবত্ব লক্ষণীয়। এখানে আলো কখনো অভিভূত', কখনো মূর্ছাতুর, (১৫/ প্রান্তিক), কখনো অনাদৃত (দেখা/ *পুনশ্চ* )। প্রৌঢ় আলোর বৈরাগ্য ('পুকুরধার/ *পুনশ্চ* ), কালো মরচে পড়া ধূসর আলো (বারো/ *পত্রপুট* ), ফ্যাকাশে (শেষপ্রহর/ *শ্যামলী* ), 'চিকন সাপের মতো বাঁকা আলো' (ধ্বনি/ *আকাশপ্রদীপ* )-রবীন্দ্র উপমা ঐতিহ্যে ব্যতিক্রমধর্মী। *পুনশ্চ* থেকে— অন্ধকারের সৌন্দর্যকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অন্ধকারের বিচিত্র রূপকে তিনি তুলে ধরেছেন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ধকারের ভয়াবহতাকে প্রকট করেছে। যেমন— "অজগর অন্ধকার (ঘরছাড়া/ *সেঁজুতি* ), অন্ধকারের পাঁজর (*পত্রপুট* ), দানোয় পাওয়া অন্ধকার (কালরাত্রি/*শ্যামলী* )। এসব অন্ধকারের রং কখনো কালো, কখনো পাটকিলে, কখনো তারা ভূতের ইশারা (বালক /*পুনশ্চ* )। এ পর্যায়ে কোন কোন কবিতায় যেমন *পুনশ্চ* কাব্যের 'শাপমোচন' এ অন্ধকারের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে, যেমন ছিল *রাজা* ও *অরূপরতন* নাটকে। এখানে অন্ধকার আকাশকে তামসী তপস্বিনীরূপে, তারাগুলিকে নীরব জপমন্ত্র হিসেবে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে অন্ধকার রাত্রির এক বিশিষ্ট মহিমা প্রকাশিত হয়েছে।

এ পর্বে মেঘের উপমায় অভিনবত্ব আছে। নগরে মেঘের আবির্ভাবকে কেশর ফোলানো, ডানাওয়ালা সিংহের উপমায় ( দেখা/ *পুনশ্চ* ) প্রকাশ বিচিত্র। বাদলের

কালো ছায়ায় শহরে ঘরের পরিবেশ মূর্ছায় অসার হাওয়ার ('বাঁশি/ *পুনশ্চ* ) দৃশ্যটি পরিচিত হলেও অভিনব যা বিবর্ণ যান্ত্রিক মূর্চ্ছাগ্রস্ত নগর নিসর্গের পরিচায়ক। টগর গন্ধরাজের পুঁজি তুলিত ঘাটে জটলা করা বউদের সাথে (ফাঁক/ *পুনশ্চ* ) বাতাসে বয়ে বয়ে আনা শিউলির গন্ধের স্পর্শ কারো ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা (ছুটির আয়োজন/ *পুনশ্চ* ), অথবা তপস্বিনী ঊষার চেলির গন্ধ (পয়লা আশ্বিন/ *পুনশ্চ* )। বুনো ফুলের উপমা বেগুনি রঙের পেয়ালা (আট/ *পত্রপুট* )।

মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের এ পর্যায়ের কাব্যের বিষয়বস্তু, উপমা/ চিত্রকল্পের ব্যবহার কবিমানসের বাস্তবতা এবং দিক পরিবর্তনের চিহ্ন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।